খুচরো ব্যবসায় বৈদেশিক বিনিয়োগের কিছু তাত্ত্বিক দিক-একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ড. শুভব্রত চক্রবর্তী

মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট বা গুণক পদ্ধতিতে অর্থশাস্ত্রে জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর বিনিয়োগের প্রভাব নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যেখানে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিনিয়োগকারী ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে।

১৯৯১ সালের আগে ভারতীয় অর্থনীতির সংরক্ষণমূলক নীতির জন্য প্রযুক্তিগত সামর্থ্য বলা যেতে পারে যথেষ্ট সম্ভাবনায় ছিল না। এর ফলে স্বদেশী ব্যবসায়ীরা দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রথমতঃ রপ্তানী ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট পিছিয়ে থাকত। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী প্রযুক্তি আমদানি করতে গিয়ে তাদের উৎপাদন করা দ্রব্যের গড় ব্যয় যথেষ্ট বেশি থাকত। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি আশির দশকে, ভারতবর্ষ ১৯৯১সালের পরে এবং পূর্ব এশিয়া সাম্প্রতিক কালে এইমস্যার কিছুটা মোকাবিলা করতে পেরেছে বিদেশী বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করার মাধ্যমে। বলাবাহুল্য যে এই পথে ১৯৯১সালের পরে এই দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসার পথও প্রশস্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক বিনিয়োগ মূলতঃ পাঁচটি মাধ্যমে প্রবেশ করে-১.কোন কোম্পানীর পুঁজির ৫১শতাংশ মালিকানার অনুমোদন (আর.বি.আই.-এর মাধ্যমে), ২. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোম্পানির পুঁজির ৫১শতাংশের বেশি মালিকানার অনুমোদন (বৈদেশিক বিনিয়োগ কমিটির মাধ্যমে),৩.'শেয়ার রাট' এর অর্জন, ৪.আর.বি.আই.-এর এন.আর.আই. নীতি, এই নীতির আওতায় বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের বিনিয়োগ চলে আসে এবং ৫.বহির্বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত ঋণ।
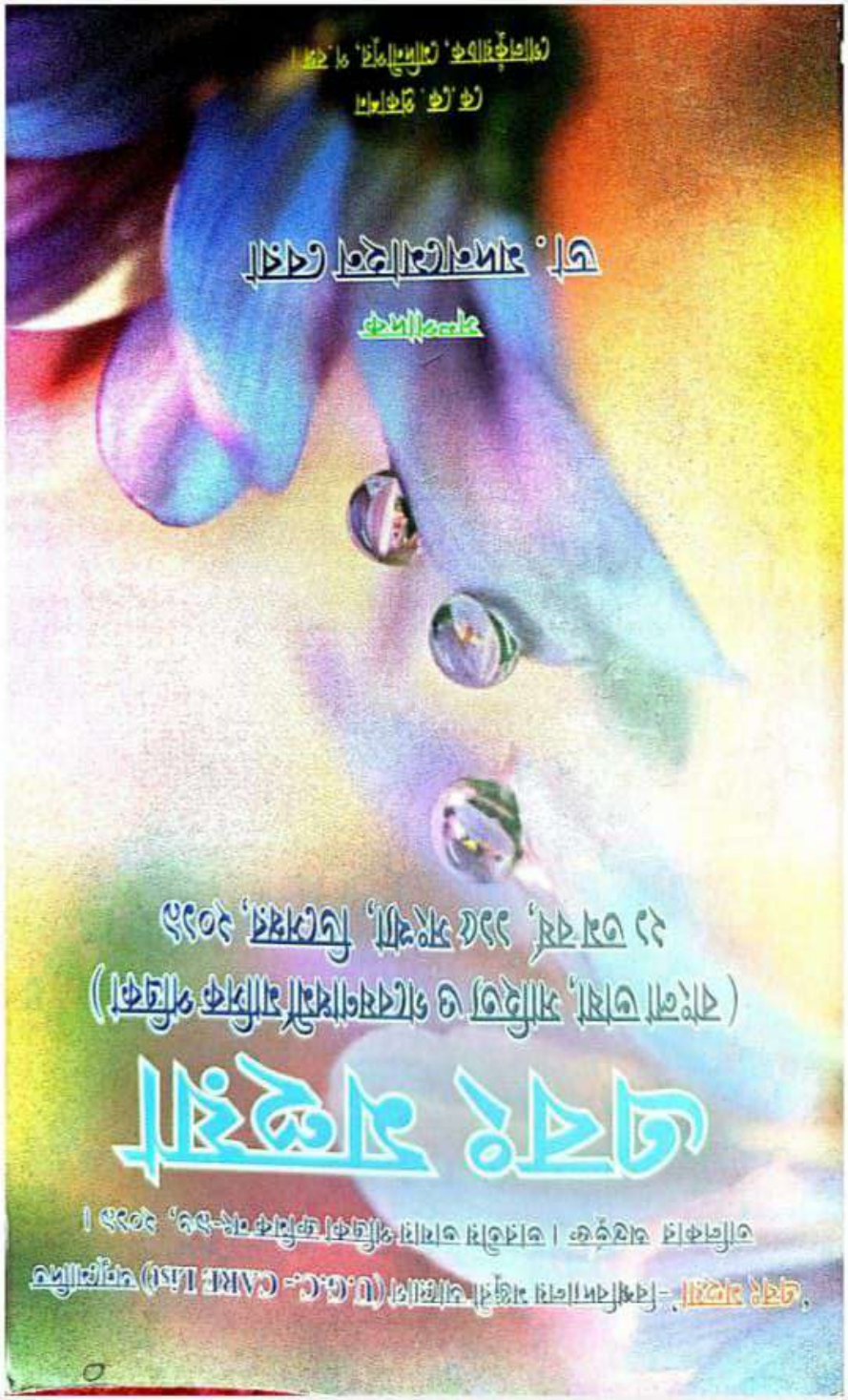
এদেশে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে একটি রাজ্যভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়। যেমন আপাতভাবে উন্নত রাজ্য দিল্লী, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাট বিদেশী পুঁজির একটা বড় অংশ বিনিয়োগ লাভে সক্ষম হয়েছে। অপর দিকে ক্ষেত্রগত দিক থেকেও এমন বৈষম্য দেখ যায়। যে ক্ষেত্রগুলিতে অধিক পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল-বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্ষেত্র,